# এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা : নারীমুক্তির রূপান্তর

সোমা ভদ্র রায়

উনিশ শতক নানা কিছু ভাঙাগড়ার সময়। বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের দাক্ষিণ্যে নারী পর্দানশিন জীবন থেকে বাইরের আলো দেখতে পায়। বাংলা সাহিত্যের নরের তুলনায় নারীর প্রাধান্য – 'পঞ্চভূত' সভার সদস্যের এই বক্তব্য নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু বাঙালি সাহিত্যিকদের তালিকায় পুরুষ লেখকরা যে নিজেদের সংখ্যাগত প্রাধান্যে নারীদের অবদমিত করে রেখেছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবু সংখ্যায় কম এবং সৃষ্টি প্রাচুর্যে পিছিয়ে থেকেও আত্মপ্রকাশের তাগিদে নারীর কলম ক্রমে সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। নারী খুঁজে পায় নিজের কণ্ঠস্বর। উপন্যাসের পাঠক থেকে ক্রমে সে লেখক হয়ে ওঠে। পুরুষশাসিত সামাজিক অবস্থান থেকে একটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করতেই হবে, পদে পদে নিষেধের ডোরে বাঁধা ছিল নারীর জীবন। তাই তাকে আত্মোন্মোচনের সুযোগ দিতে আমাদের সমাজে অনেকটা দেরী হয়ে গেছে। বিদ্যার দেবী স্বয়ং নারী হলেও বিদ্যাচর্চার অধিকার নারীকে দেওয়া হয় নি। বরং কালি-কলম আর মনের সংযোগ ঘটলে জীবন অভিশপ্ত হতে পারে এমন অযৌক্তিক বিধানেই নারীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার চেষ্টা করা হয়েছে। উনিশ শতকের সমাপ্তি পর্ব থেকেই ধীরে ধীরে বাংলার সারস্বত ক্ষেত্রে নিজেদের পায়ের তলার জমিটা তারা খুঁজে নিতে শুরু করেছিল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে সংখ্যাগত দিক থেকে খুব বেশি নারী ঔপন্যাসিকের দেখা না পাওয়া গেলেও পুরুষতান্ত্রিক আবহের ভিতর থেকে নারীর নিজস্ব কণ্ঠস্বরটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা তারা শুরু করেছিলেন। পুরুষের নির্ধারিত বিধানের ঘেরাটোপকে তেমনভাবে অগ্রাহ্য করতে না পারলেও ক্রমসঞ্চিত একটি ক্ষোভ ভিতরে ভিতরে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল। সেই সম্ভাবনাই মূর্ত হয়েছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর উপন্যাসে। বাঙালি লেখিকাদের তুলনায় স্বতন্ত্র গোত্রের, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ জ্যোতির্ময়ী দেবী। মনোরঞ্জন কাহিনি নির্মাণের বদলে তিনি সামাজিক নানা অবস্থান থেকে নানা ধরনের প্রশ্ন তুলতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাস 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' থেকে আমরা চিনে নেব তাঁর চিন্তার অভিমুখ। আসলে তাঁর ভাবনার মূল কেন্দ্রে আছে নারী। 'মেয়েদের দাম শুধু একজন মানুষের দরকারে? সমস্ত সম্পর্ক অতিক্রম করে মানুষ হিসেবে তার মূল্য নেই"[১]? এমন প্রশ্ন আজকের নারী আন্দোলনের ক্রমবিস্তারের যুগে মুক্তিকামী মহিলাদের কণ্ঠে প্রায়শ শোনা যায়। কিন্তু এ প্রশ্ন যদি তোলেন এমন একজন নারী যাঁর জন্ম উনিশ শতকের প্রান্তসীমায় এবং পুরুষতন্ত্রের আঁটোসাঁটো কাঠামোয় যাঁর বড় হয়ে ওঠা, তাঁর সম্পর্কে তাহলে একটু আলাদা করে ভাবতেই হয়। রীতিমতো অবাক হতে হয় যখন আমরা দেখি, ঘরকেই পৃথিবী মনে করে আত্মতৃপ্তি বোধ করার কূপমণ্ডুকতা থেকে বেরিয়ে এসে একজন নারী তাঁর কলমে বাংলা কথাসাহিত্যকে প্রাদেশিকতার

সীমা পার করিয়ে বৃহত্তর ভারতীয় প্রেক্ষাপট সন্ধান করে নিচ্ছেন। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের ভূগোলও আমাদের চেনা চৌহদ্দি পেরিয়ে চলে গেছে অনেক দূর।

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাস দেশভাগকে কেন্দ্র করে রচিত। স্বাধীনতার দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্ব, দীর্ঘ সংগ্রাম আর দীর্ঘ অপেক্ষা সার্থক হল সাতচল্লিশ সালে। অথচ তার সঙ্গে এল অচরিতার্থতা আর স্বদেশ হারানো মানুষের রক্তাক্ত যন্ত্রণা। স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলো মলিন হয়ে গেল আর্ত মানুষের হাহাকারে, স্বাধীনতার মূল্য দিতে হল লজ্জা, সম্ভ্রম, সম্মান দিয়ে। দেশবিভাগের যন্ত্রণাদীর্ণ সে সব কথা উঠে এসেছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সাবিত্রী রায়ের লেখায়। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের কেন্দ্রেও আছে দেশ বিভাগের দাঙ্গায় বিধ্বস্ত এক নারীর জীবন কথা। দাঙ্গায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটি পরিবারের মেয়ে সুতারা – এক রাতে যার চোখের সামনে থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে তারা বাবা, মা ও দিদি। দেশভাগের অশান্ত দিনগুলি থেকে স্বজনহারা গৃহহারা সুতারার আত্মপ্রতিষ্ঠার আখ্যান 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'। দেশ কেন ভাগ হয় – এর কোন একমাত্রিক উত্তর পাওয়া হয়ত সম্ভব নয়। ভৌগোলিক সীমারেখা রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রকে মানচিত্রে যেভাবে আলাদা করে মানুষের মনকে সেভাবে খণ্ডিত করা যায় কি? দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রনেতাদের দেশকে বিভাজিত করার নীতি তাই হয়তো মানুষকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে। নতুন দেশের নাগরিক হতে গিয়ে প্রবল জীবনযুদ্ধে সামিল হতে হয় তাদের। দেশভাগের ভিত্তিতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বা পশ্চিম থেকে পূর্বে যেতে বাধ্য হয়েছে যারা তারা চিন্তা চেতনায় অহরহ বয়ে বেড়ায় দেশভাগের যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্মৃতি। তাদের কথায় অবশ্যম্ভাবীরূপে ফিরে ফিরে আসে ফেলে আসা দেশ মাটির কথা। পরাধীন ভারতবর্ষে ১৯০৫ এ যখন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দেশভাগের পরিকল্পনা করেছিল তখন তার পিছনে ছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলেসি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দমন নীতি সেখানে সক্রিয় ছিল। তখনকার পরাধীন ভারতবাসী যে বিপুল বিক্ষোভ দেখিয়েছিল তা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন নামে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। ব্রিটিশ সরকার সেই নীতি প্রত্যাহার করে চাপে পড়ে। সেই দীর্ঘ সংগ্রামের মর্যাদা পরবর্তী সময়ে অক্ষুন্ন রইলো না। স্বাধীন ভারত স্বাধীনতা ক্রয় করলো দেশভাগের মূল্য দিয়ে। ১৯৪৭ দেশভাগ স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দকে অনেকটা ফিকে করে দিয়েছিল। দেশভাগের যন্ত্রণা আরও তীব্র আকার নেয় যখন তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় নারীর অপমান, অসম্মান, লাঞ্ছনা। সেই কথারই প্রকাশ এ কাহিনিতে। স্বাধীনতা নারীর জীবনে কী দুর্বিষহ কালিমা বহন করে এনেছিল সে কাহিনিই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন – 'সকল যুগের সকল অপমানিতা লাঞ্ছিতা নারীদের উদ্দেশে'।[২] এই উৎসর্গ পত্রটিই যেন উপন্যাসের মূল কথাটিকে ধরিয়ে দেয়। আসলে তিনি জানতেন কাপুরুষের হাতে রচিত হয় না সত্য ইতিহাস। তাই তিনি আমাদের জানিয়ে দেন –"নারী কবি মহাকবি নেই। থাকলেও নিজেদের মান, লজ্জা, মর্যাদা, সম্ভ্রমহানির কথা লিখতে পারতেন না। সে ভাষা আজও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নি। তাই স্ত্রীপর্বের কোনো ইতিহাস কোথাও নেই।"[৩] প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্ত্রী পর্বের ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন লেখিকা। মনে রাখা জরুরি এই উপন্যাসটির নাম ছিল 'ইতিহাসে স্ত্রী-পর্ব' পরে প্রকাশকের অনুরোধে নামটি বদলে 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' রাখা হয়।

১৩৭৩ সালের 'প্রবাসী' শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল উপন্যাসটি। তখন 'ইতিহাসে স্ত্রী-পর্ব' নামটিই ছিল। আসলে আখ্যানের মধ্যে যে ভাবে পর্ব ভাগ করেছেন

লেখিকা তার মধ্যেও এসেছে মহাভারতের অনুষঙ্গ। আদিপর্ব, অনুশাসনপর্ব, স্ত্রীপর্ব - কারণ তিনি জানেন এখনও স্ত্রী পর্বের সমাপ্তি হয় নি। শেষ কথার শেষ হয় নি'।[৪] ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গায় দুই বাংলাতেই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে হতাহত হয়েছিলেন। কিন্তু তার থেকেও ভয়ঙ্কর ছিল নির্বিচারে নারীদের সঙ্গে ঘটে চলা লাঞ্ছনা, সম্মানহানি ও অত্যাচার। সেই ইতিহাস যে লিপিবদ্ধ হবে না তা জানতেন লেখিকা। সেই নিরিখে তাঁর এই কাহিনিকথন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর কন্যা অশোকা গুপ্ত ১৯৪৬ খ্রি. নোয়াখালির দাঙ্গায় এগিয়ে গিয়েছিলেন সমাজসেবার কাজে। দুর্গতদের একেবারে কাছ থেকে দেখবার অভিজ্ঞতার কথা তিনি ভাগ করে নেন মায়ের সঙ্গে। সংবেদী হৃদয় জ্যোতির্ময়ী দেবী সমস্ত বিষয়টি আত্মস্থ করেন। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ছুঁয়ে ফেলেন অসীম মর্যাদায়। অপমানিত, লাঞ্ছিত নারীর বেদনা রূপ পায় 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসটিতে। আশ্চর্য যুক্তিসিদ্ধতায় তিনি প্রশ্ন তোলেন – "বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, বাঙ্গালির ইতিহাস নাই' ... আমরা একালে মনে মনে ভাবছি কেন নারীর কোনো ইতিহাস নেই। মানবজাতির অর্ধেক হলে কি হয়, তার সুখ দুঃখের ধর্মের, বেদনার, আনন্দের, সামাজিক ভালোমন্দ বিচারের কোনো ইতিহাসই তাদের নিজের মুখে বলা বা লেখা নেই। পুরুষের পরিপূরকভাবেই তার কর্মজগৎ, ধর্মজগৎ, তার প্রেমের জগৎ, তার ত্যাগ ও দায়িত্বকে দেখা হয়েছে। পুরুষই দেখেছেন তাঁর দৃষ্টি দিয়ে। চিরকাল বলেছেন তাঁর মনের কথা তাঁর নিজের ভাষা দিয়ে। কর্মজগৎ আদর্শ জগৎ রচনা করে দিয়েছেন হয়তো নিজেদের সুবিধাবাদের বিধি নিষেধ দিয়েই। কিসে তার সুখ, কিসে তার দুঃখ, সে কথাও তাঁরাই নিজের ভাষায় বলে দিয়েছেন কিন্তু সত্যিই কি তাতে তাঁদের মনের আর জীবনের সব কথা বলা গেছে এবং যা বলা হয়েছে তা কি সব সত্য?"[৫] এই দৃপ্ত শাণিত উচ্চারণ যাঁর তিনি সে কাহিনি কথনে নারীর যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলতে দ্বিধাহীন হবেন সে কথা অবশ্যম্ভাবী। অনেক বড়ো ক্যানভাসে জীবনকে, মেয়েদের জীবনকে, ভাগ্যতাড়িত যে কোনো মানুষের জীবনকে দেখেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। তাই একটি মেয়ের লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, বঞ্চনা কখনোই তাঁর কাছে একক ব্যক্তিমানুষের বেদনা হয়ে থাকে নি, দেশের হাজার হাজার মানুষের দুঃখ অপমান ক্ষোভের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দিয়েছেন জ্যোতির্ময়ী। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে লাঞ্ছিতা সুতারা ভেবেছে – "অকারণে লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা, উপেক্ষিতা, পরিত্যক্তা নারীর সব কালের মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে সে মনে মনে।"

রাজনৈতিক সংকট জ্যোতির্ময়ী দেবীর সমসাময়িক নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে খুব বেশি ছায়া ফেলে নি। জ্যোতির্ময়ী দেবী ভিন্ন গোত্রের। তাই দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িকতার মতো একটি সংবেদনশীল বিষয় উপন্যাসের প্রেক্ষিত হয়ে উঠেছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াল দিনগুলির চেহারা যেমনই হোক, পুরুষের চোখে সারা দেশের সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের মেয়েদের জাত সেদিন এক হয়ে যায়। কারণ মেয়েদের শরীর দখল আসলে পুরুষদের ক্ষমতায়নের চিহ্ন, মেয়েদের শরীরের উপর তাই কাপুরুষের অত্যাচারের কোনো ধর্মভেদ নেই, বর্ণভেদ নেই। ধর্ষকের একটিই পরিচয় সে পুরুষ , আর সমগ্র দেশের সব মেয়েই সেদিন হয়ে ওঠে একটি জাত – পুরুষভীত জাত। এই অনুভূতি থেকে সুতারার একক জীবনের যন্ত্রণায় মিশে যায় অসংখ্য লাঞ্ছিতা নারীর বেঁচে থাকার গ্লানি। ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই এ কাজটি করেন। দেশভাগের ফলে নারীর বিপন্নতা, যন্ত্রণার ছবি ধরা পড়েছে এ উপন্যাসে। সুতারা, নোয়াখালির দাঙ্গার শিকার। তার পুরো পরিবারই বিপর্যস্ত এই

দাঙ্গায়। কিশোরী সুতারার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যায় তার দিদি, সম্ভ্রম বাঁচাতে মা ঝাঁপ দেন পুকুরে। বাবাও নিখোঁজ হয়ে যান। সুতারা লাঞ্ছিত হয় অসহায়ভাবে। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় জোটে তার বন্ধু সাকিনার বাড়িতে। সাকিনা মুসলমান হলেও তাদের বাড়িতে দাঙ্গা-বিপন্ন বাকি দিনগুলো নিরাপদে কাটিয়েছিল সুতারা। সাকিনার মা, তমিজ সাহেবের স্ত্রী অপরিসীম স্নেহে সেবা করে সুস্থ করে তোলেন ধর্ষিতা সুতারাকে। কিন্তু তারপর কোথায় যাবে সে? কোথায় স্থান হবে তার? বিভক্ত স্বাধীন ভারতের মাটিতে স্থান হওয়া সহজ হয় নি সুতারার পক্ষে। তমিজ সাহেব ও তার বড় ছেলে আজিজ অনেক ঝুঁকি নিয়ে সুতারাকে কলকাতার তার দাদার শ্বশুরবাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অপহৃতা অত্যাচারিতা মেয়েকে হিন্দুসমাজ ও পরিবার গ্রহণ করতে চায়। দাদার শ্বশুরবাড়িতে জোটে কুৎসিত গঞ্জনা – "একপাশে হাড়ি-বাগদীর মতো দাঁড়িয়ে থাক, তা না সব জাতে একাকার করতে বসলো। কিছু আর বাকী রইলো না। কি খেয়েছে, কি করেছে, না করেছে কে তার খবর জানে।"[৬] লাঞ্ছিতা সুতারা এইভাবে প্রতিমুহূর্তে অপমানিত হয় স্বদেশে, স্বজনের কাছে।

সুতারাকে নিয়ে পরিবারে বিড়ম্বনা বাড়ে। তাই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বোর্ডিং স্কুলে। স্কুলের গরমের বা পুজোর ছুটিতে সবাই যখন বাড়ি যায়, সুতারা তখনও পড়ে থাকে বোর্ডিং–এ। কেউই তাকে বাড়িতে নিয়ে আসতে যায় না। আসলে কোনো বাড়িই তো আর নেই তার, ভেঙ্গে গেছে তার আশ্রয়। সরে গেছে পায়ের তলার মাটি। দেশবিভাগে ঘর হারানো মেয়ে সুতারার যন্ত্রণা হয়ে ওঠে সমকালের ও চিরকালের সমস্ত মেয়ের যন্ত্রণার দিনলিপি। এই কাহিনি কি কোনো পুরুষের পক্ষে লেখা সম্ভব! তাই সংগত প্রশ্নই করেন লেখিকা – "কোন্ কালি কোন্ ভূর্জপত্রে সেকথা কোন্ পুরুষ কবি লিখবেন? যে কালি কাগজ লেখনীর আজও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নি।"[৭] আমাদের কথা নামে এ উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি প্রাসঙ্গিকভাবেই বলেছেন - "আমার মনে হয়েছে সিন্ধু ভরা রক্তের কালিতে মহাকালের ইতিহাসের পাতায় সত্যই যদি সরস্বতী আমাদের লাঞ্ছনা ও বেদনার ইতিহাস লিখতেন তাহলেও ওই অপমানের দুঃখের বেদনার রক্তাক্ত কাহিনি লিখে সমাপ্ত করতে পারতেন না।"[৮]

জ্যোতির্ময়ী দেবী দেখেছেন বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বপ্নময় রূপ, আবার সেই রূপকে দেশভাগ এবং ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণায় খণ্ডিত হয়ে যেতেও দেখেছেন। উপলব্ধি করেছেন দেশ জুড়ে দাঙ্গা বাধায় পুরুষ আর শরীর দিয়ে সম্ভ্রম দিয়ে তার মূল্য দিতে হয় মেয়েদের। বাস্তুচ্যুত হওয়ার বেদনা তো নারী পুরুষ উভয়েরই কিন্তু সম্ভ্রমহারা ধর্ষিতা নারীর লাঞ্ছনা অন্য মাত্রা জুড়ে দেয় সেই অবর্ণনীয় যন্ত্রণায়। এ কাহিনিতে বিবৃত আছে সেই যন্ত্রণার কথা। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েন ও সমস্যা দেশবিভাগের পিছনে সক্রিয়। এ গল্পের সুতারা মুসলমান গৃহে আশ্রয় লাভের দোষে নিজের সমাজেই অপাংক্তেয় হয়ে রয়ে গেছে আজীবন। কিন্তু এও তো সত্য যে মুসলমানের হিংস্রতা যেমন তাকে গৃহহীন করেছে তেমনই মুসলমানের অমেয় মমতা তাকে বাঁচিয়েওছে। অথচ সে কথাটার কোন মূল্য দেয় নি তার পরিবার পরিজন। জ্যোতির্ময়ী দেবী সচেতনভাবেই আখ্যান জুড়ে নানা আলাপ আলোচনায় ভারত ইতিহাসের প্রসঙ্গকে নিয়ে এসেছেন। সেসব প্রতর্কে উঠে এসেছে ইতিহাসের বিভিন্ন উদার অসাম্প্রদায়িক ঘটনার কথা। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন রাজস্থানের কথা, সেখানে মেয়েরা মুসলমান স্পৃষ্ট হওয়ার ভয়ে জহরব্রত করেছে দলে দলে, আবার অন্যদিকে সেই রাজস্থানের মাটিতে হুমায়ুন বাদশাকে ভাই বলে রাখি পাঠিয়েছেন রানী কর্ণাবতী। গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী সম্রাট

ঔরঙ্গজেব ও উদয়পুরের রানীর রাখি-বন্ধ-ভাই হয়েছেন। এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের সম্পর্কে যে আসলে দুটি ব্যক্তিমানুষেরই সম্পর্ক মানবিকতার সেই বন্ধনকে বারে বারেই প্রকাশ করেছে লেখিকার কলম। সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি মানুষকে ক্রমাগত সংকটের দিকেই নিয়ে যায়। হিংসা, বিদ্বেষ, মৌলবাদী উন্মত্ততার ঘৃণ্য জগৎ তৈরি করে পুরুষ, আর অত্যাচারিত হয় মেয়েরা। মেয়েদের উপর লাঞ্ছনা, অত্যাচারের কোন ধর্মভেদ নেই, বঞ্চিত অপমানিত সব মেয়েরাই তাই এক জাত, এক ধর্ম, এক বর্ণ।

তবে বাস্তবের প্রখর বঞ্চনার পাশাপাশি ঔপন্যাসিক এঁকে যান আলোর পথ, বলে যান আশার কথা। মেয়েদের জীবনে বলা ভালো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের জীবনে আলো আসতে পারে একটিই পথে সেটি শিক্ষা। শিক্ষার শক্তিতেই একজন মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, খুঁজে নিতে পারে জীবনের সঠিক পথ। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মেয়েরা চিনে নেবে আপন সত্তাকে, উপলব্ধি করবে আত্মমর্যাদার যথার্থতাকে, তাই এই গল্পে সুতারা শিক্ষার আলোয় নিজের জীবনের পথ চিনে নিতে চেয়েছে। শিক্ষা অর্জন করে দিল্লির যাজ্ঞসেনী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দিয়েছে সুতারা। কাহিনি প্রারম্ভের অধ্যায় তাই সুতারার নামেই চিহ্নিত। এ এক তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা । জীবনের উড়ান বহু বেদনাময় রক্তক্ষরণের পরই সম্ভব হয়েছে সুতারার পক্ষে। গল্প তাই চলচ্চিত্রের মত ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে গেছে আদি পর্বে, অনুশাসন পর্বে ও স্ত্রীপর্বে। বর্তমান থেকে অতীতে গিয়ে আবার বর্তমানে ফিরে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন লেখিকা। অপূর্ব এক কাহিনি কথন ভঙ্গিমা এ গল্পকে দিয়েছে এক অনন্য সহজতা।

জীবনে মানুষ একা বাঁচতে চায় না। হয়ত পারেও না। তাই এক জীবন খুঁজে নেয় অন্যকে। মানুষ খুঁজতে চায় তার দোসর। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা পেয়েও সুতারা তাই মানসিকভাবে শান্তি পায় না। বন্ধু সাকিনা ও তার পরিবার বিপদে যেভাবে সুতারাকে আশ্রয় দিয়েছে সে কথা কখনো বিস্মৃত হয় নি সে। সাকিনা পরিবারের সবার প্রতি তার হৃদয়ে ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। কিন্তু এখানেও লেখিকা বাস্তবাদী মনস্তত্ত্বকে অবলম্বন করেন। সে জঘন্য অপরাধের শিকার সুতারা হয়েছে তার কিশোরীবেলায় সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি কখনও মুছে যায় না তার মন থেকে। তাই ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি অন্তরের গভীরে রয়ে গেছে প্রবল ঘৃণা। সাকিনার পরিবারের স্নেহস্পর্শও তা দূর করতে পারে না। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অন্য একজন মানুষ। কিশোরী সুতারার প্রতি, বিপন্ন সুতারার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল সম্পর্কে তার বৌদির ভাই প্রমোদ। সব বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে সে বাড়িয়ে দিয়েছে ভালবাসার হাত। যে পরিবার পরিজন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, অকৃতজ্ঞতার গ্লানি মুছিয়ে দিয়েছে সেই পরিবারেই একজন, সুতারার পাণিপ্রার্থী প্রমোদ । তার মুখে উচ্চারিত হয়েছে – "তুমি তোমার কাকাসাহেবের ঘরে ছিলে, আমি জানি তাঁর চেয়ে মহৎ লোক আর কেউ তখন সেখানে ছিল না তোমার কাছে, তাও জানি।"[৯] – এ কথাতেই সুতারার সব সংকোচ গ্লানি দূর হয়েছে। প্রমোদের সহজ শ্রদ্ধার ও বিশ্বাসের কথাটুকুতেই যেন কেটে যায় সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার জাল, এমন আস্থাই তো ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারে মৌলবাদী ধর্মবিভেদের কূটচালকে। সুতারার পরিচিতরা যখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন প্রমোদের এই উচ্চারণ সুতারাকে আশ্বস্ত করে।

তবে মননশীল লেখিকা কোনো প্রেমের কাহিনি লিখতে বসেন নি। তাই নিটোল কোনো বয়ান এখানে আশা করলে ভুল হবে। এ গল্প এক গৃহহীন নারীর প্রেমের

ঘরে ফেরার গল্পও নয়। বরং বিপন্ন স্বদেশের পটপ্রেক্ষায় অপরাহত মানুষের স্বকীয়তা অর্জনই এ কাহিনির মূল বিষয়। তাই মিতায়তন এই উপন্যাসের কথা বলতে গিয়ে কোন প্রাজ্ঞ সমালোচক খুঁজে পান দেশভাগ নারীকে কতটা লুণ্ঠিত করেছিল তার খতিয়ান। আর সেই সংগ্রাম পেরিয়ে একজন নারী কীভাবে আত্মমর্যাদায় প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে এ যেন তারই বিবরণ। আসলে সুতারা যেন আমাদের "রাজনৈতিক অভিশাপের প্রতীক" হয়ে ওঠে। আবার সদর্থক ভাবনার দিশারী জ্যোতির্ময়ী দেখিয়ে দেন কিভাবে সুতারা অতিক্রম করে যায় সেই 'অভিশাপ'কে। এ উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ পড়ে বিদেশি সমালোচকের মনে হয়েছিল উর্বশী বুটালিয়ার 'দি আদার সাইড অফ্ সাইলেন্স' বইটিতে আছে দেশভাগের কারণে ছিন্নমূল পাঞ্জাবের নারীদের নির্যাতনের নীরবতার বিশ্লেষণ আর 'সেই নীরবতাই মুখর হয়ে উঠেছে', এ উপন্যাসে।

দেশভাগ নিয়ে আলোচনা চলতে থাকবে। আজকের প্রজন্ম যদি প্রশ্ন করে তবে কী জবাব দেব আমরা! রাষ্ট্রনেতাদের ক্ষমতার লোভ, অবিমৃশ্যকারীতাকেই দোষ দেব? আর রাষ্ট্রনীতির চাপান উতোর বুঝতে না পারা অসহায় মানুষের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া, শরণার্থী, উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল হওয়াই কী হবে এক্ষেত্রে একমাত্র পরিণাম? আর এই পরিস্থিতিতে মেয়েদের উপর ঘটে চলা নিরন্তর অত্যাচারকে কী বলে ব্যাখ্যা করবো! জ্যোতির্ময়ী দেবী যেন সেই চলমান ইতিহাসকে ধারণ করেন এক কাহিনির আধারে। বাস্তবতাকে ছুঁয়ে এক অনিবার্য প্রশ্ন তোলেন, নারীর অবস্থান থেকে যার উত্তর চান তিনি। দেশভাগের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে ভয়ংকর আবহে কাহিনি স্থাপন করে তিনি তাঁর মননঋদ্ধ সচেতন সত্তার পরিচয় রেখেছেন। নারীর যন্ত্রণার ছবিটি এঁকেছেন বহুমাত্রিকতায়, তুলে ধরেছেন তার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার রূপটিও। আর এ উপন্যাসের শেষে দিতে চেয়েছেন এক আলোর দিশা যা আমাদের মধ্যে জন্ম দেয় এক সদর্থক বোধের, যন্ত্রণা পেরিয়ে যা মানুষকে বাঁচাতে শেখায়। ভাগফল তখন আর শূন্য বলে মনে হয় না।

তথ্যঋণ ঃ


১. জ্যোতির্ময়ী দেবী – 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অফ উইমেনস্ স্টাডিজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ১৯৯১, পৃ – ৬১।

২. জ্যোতির্ময়ী দেবী – 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং।

৩. তদেব, পৃ – ১২৫।

৪. তদেব, পৃ – ১২৫।

৫. জ্যোতির্ময়ী দেবী – 'নারীর ইতিহাস, 'চিরন্তন নারী জিজ্ঞাসা', অনন্য প্রকাশন, কলকাতা ১৯৫৫, পৃ - ১৩২।

৬. জ্যোতির্ময়ী দেবী – 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অফ উইমেনস্ স্টাডিজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ১৯৯১, পৃ – ১৬১।

৭. তদেব, পৃ – ১২৫।

৮. তদেব, পৃ – ১২৫।

৯. শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত – না আমরা ভুলি নি, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ শে আগস্ট ২০২০।